Rs. 3.00

পাঁচ সিকে পাঁচ আনা

স্বামী শিবানন্দ গিরি মহারাজ প্রতিষ্ঠিত

কৈলাস-৭৫
মাসিক সংঘ পত্রিকা

তুমি, আমি, সামনে যাকে দেখছ, দেখছি সবাই গুরু। শিষ্য ভক্তির অমূল্য প্রণাম দিয়ে গুরুকে জাগিয়ে তোলে। কুমোরটুলিতে সারি-সারি প্রতিমা ছিল। তুমি একটা বেছে নিলে। শ্রদ্ধায় ঘরে আনতেই সে ঠাকুর হয়ে গেল। যে কুলিটা মাথায় করে আনল প্রতিমাকে তাকে আর ছুঁতে দিলে না ঠাকুরকে। এখন তার ক্ষুধা পায়, ঘুম পায়, ঘুম ভাঙাতে হয়। দেখ প্রতি-টি মা। মা বলে চিনলেই প্রতিমা। প্রতিমাকে জানলেই সে জগদম্বা। আমরা প্রতিমাকে পূজা করি না। প্রতিমাতে পূজা করি।

—স্বামী শিবানন্দ গিরি

স্বামী শিবানন্দ গিরি মহারাজ

পাঁচ সিকে পাঁচ আনা

Central Regn. No.—R.N. 32810/1977
Postal Regn. No. KOL RMS/38/2025-2027

।। পঞ্চাশ বর্ষ, ১তম সংখ্যা।। ভাদ্র ১৪৩৩

সম্পাদকীয়

পঞ্চাশ বছরের জয়যাত্রা অক্ষুন্ন রেখে শুভ ভাদ্র পূর্ণিমা আবার ফিরে এল। পঞ্চাশ বছর আগে ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৭ 'পাঁচ সিকে পাঁচ আনা' পত্রিকার শুভ জন্ম। আজ এই শুভ দিনে আমাদের পত্রিকার পাঠক পাঠিকা, সদস্য সদস্যা এবং শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। ১৯৭৯ সালের এই ১১ই সেপ্টেম্বরেই 'কৈলাস' এই পত্রিকার দায়িত্ব নিয়েছে। বর্তমানে প্রতিমাসে ৪০০ কপি পত্রিকা ছাপা হয়।

১১ই সেপ্টেম্বর আমাদের কাছে একটি বিশেষ স্মরণের দিন। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর আমরা হারিয়েছি আমাদের আশ্রম পিতা শ্রীশ্রীঠাকুর বিশ্বনাথদেবকে। তাঁকে হারানো নিশ্চয়ই আমাদের এক বিরাট ক্ষতি। কিন্তু আমরা আজও কোন অভাব বুঝতে পাইনা কারণ অপ্রকট হয়েও ঠাকুর আমাদের সব অভাব পূর্ণ করে দিচ্ছেন। ঠাকুরের স্মরণতিথিকে আরও স্মরণীয় করতে আমাদের প্রাণপুরুষ 'কৈলাস' পতি স্বামী শিবানন্দ গিরি মহারাজ এই দিনে 'আনন্দম্ গ্রন্থাগার' এবং 'পাঁচ সিকে পাঁচ আনা' পত্রিকার উদ্বোধন করেছিলেন। 'নাম কীর্তনের' সুরে ছন্দে এই দিনটিকে একটি পূজার দিনের রূপ দেওয়া হয়।

আমরা এও জানতাম না এই ১১ই সেপ্টেম্বরের আরও একটি বিশেষত্ব। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগোতে Parliament of Religion-এ এক অসাধারণ ভাষণ দিয়ে ভারতের আধ্যাত্মিক মানচিত্রের সঙ্গে আমেরিকার পরিচয় ঘটালেন।

পত্রিকা ও গ্রন্থাগারের শুভ জন্মলগ্নে শ্রদ্ধেয় চিন্তাবিদ এবং মনীষীদের অসাধারণ বাণীগুলি আমাদের হৃদয় স্পর্শ করেছিল। 'যেনাহং নামৃতা স্যাৎ কিমহং তেন কুর্যাম।' যা অমৃত এনে দেয় না তা নিয়ে আমি কি করবো। বলেছিলেন ডঃ রমা চৌধুরী। শ্রীনারায়ণচন্দ্র গোস্বামী মহারাজের প্রশংসা করে বলেছিলেন স্বামী শিবানন্দ গিরিজী কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আশ্রমের ছেলেমেয়েদের বিদ্যা-চর্চার দিকে নজর দিয়েছেন এটা খুব আনন্দের কথা।

গ্রন্থাগার পত্রিকা একসঙ্গে কেন? এপ্রসঙ্গে মহারাজের বাণীটি মনে রাখার মত। আগে পড়, তারপর লেখো। আগে বোঝ তারপর বল, আগে পড়ে উপলব্ধি করো তারপর প্রচার করো। পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মহারাজের বক্তব্য নিজেকে প্রকাশ করতে না পারার একটা যন্ত্রণা আছে। আবার যে কোন জায়গায় নিজেকে প্রকাশ করা যায় না। এই পত্রিকা হবে আমাদের নিজেদের প্রকাশভূমি। জানিনা

আজ পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে এসে আমরা কতটা মহারাজের কথার মূল্য দিতে পারছি। তবে একথা সত্য মহারাজের প্রদর্শিত পথেই আমরা আমাদের পাঠক-পাঠিকাদের কাছে সেই আনন্দ পৌঁছে দেবার প্রয়াসী।

বৎসরের প্রথম সংখ্যায় 'কৈলাস' সংস্থার গত বছরের কর্মকান্ডের একটা বিবরণ দেওয়া হয়তো দরকার আপনাদের সকলের অবগতির জন্য। মহারাজের শুরু করা কাজের অধিকাংশ হয় বন্ধ নাহয় সংক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। তবু কিছু পুরোনো এবং অনেক নতুন ভক্ত-অনুগামীদের প্রচেষ্টায় আজও মহারাজের কর্মধারা বহমান।

প্রথমেই উল্লেখ করছি হুগলী জেলার সোমরাবাজার গ্রামে অবস্থিত কৈলাসের বালকাশ্রম 'বিবেকানন্দ স্নেহনীড়ের' কথা। কৈলাসের সামগ্রিক কাজের মধ্যে প্রধানতম কাজ এই বালকাশ্রম চালানো। গ্রামের দরিদ্র পরিবারের আঠারোজন বালককে এই আশ্রমে রেখে তাদের পড়াশুনা এবং নানারকম ব্যবহারিক

কাজের প্রশিক্ষণ দিয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করাই আমাদের লক্ষ্য। ১৯৮২ সাল থেকে আজ পর্যন্ত এই আশ্রম থেকে বহু ছেলে তৈরী হয়ে আজ সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত। এই নবনির্মিত সুন্দর আশ্রম থেকে সারা বৎসরই গ্রামের মানুষদের নানারকম সেবাকার্য পরিচালিত হয়। বিনা ব্যয়ে গ্রামের মানুষদের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা এবং চক্ষু-পরীক্ষান্তে বিনাব্যয়ে চশমা দেওয়া হয়।

উত্তর চব্বিশ পরগণার আগরপাড়ায় আছে আমাদের পূজা-সেবা কেন্দ্র 'শিবানন্দ স্নেহনীড়'। এই আশ্রমটি মূলতঃ তৈরী হয়েছিল মহারাজের বৃদ্ধাশ্রম প্রতিষ্ঠা করার বাসনাকে রূপায়িত করতে। স্বীকার করতে বাধা নেই শ্রীগুরুর সেই বাসনাকে আমরা পুরোপুরি রূপায়িত করতে পারিনি। তবে আমাদের পরিচিত জনেদের মধ্য থেকে চারজন মহিলা এই আশ্রমে থাকেন এবং 'কৈলাস তাঁদের সমগ্র পূজা সেবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। এই আশ্রমে শ্রীশ্রীগুরু-মহারাজের নিত্যপূজা ও নাম-সংকীর্তন হয়। সারা বৎসরই নানান উৎসবের মধ্য দিয়ে পূজা এবং সেবাকার্য চলে। শ্রীশ্রীগুরুপূর্ণিমা এবং মহারাজের জন্মোৎসব এই কেন্দ্রে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। এখানে আছে একটি হোমিওপ্যাথিক ক্লিনিক যেখান একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক নিয়মিত রুগীদের সেবা করেন। সারা বৎসরই নানান উৎসবের মধ্য দিয়ে আমরা বস্ত্র-বিতরণ, খাদ্যসামগ্রী বিতরণ, স্থানীয় স্কুলের ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনার সামগ্রী বিতরণ করে থাকি।

সবশেষে বলি আমাদের মূলকেন্দ্র 'আনন্দ আশ্রম'-এর কথা। শ্রীশ্রীঠাকুর বিশ্বনাথদেবের লীলাভূমি এবং স্বামী শিবানন্দ গিরি মহারাজের সাধনক্ষেত্র এই আশ্রম আমাদের সকল কাজের মূল প্রেরণাক্ষেত্র। 'কৈলাস'-এর সমস্ত কাজই পরিচালিত হয় এই আশ্রম থেকে। সারা বছরে নানান উৎসবের মধ্য দিয়ে আমরা আনন্দলাভ করি এই আশ্রমে। এছাড়াও আছে আমাদের প্রিয় শনিবারের কীর্তন। আজও প্রতি শনিবার আনন্দ আশ্রম মুখরিত হয় কীর্তন আনন্দে।

আধ্যাত্মিক এবং সমাজসেবার কাজ ছাড়াও স্বামী শিবানন্দ গিরি মহারাজের আরো একটি বিশেষ পরিচয় ছিল, সেটা হল তাঁর সাংস্কৃতিক জগতে অগাধ বিচরণ। সন্ন্যাসের পূর্বে তিনি বহু থিয়েটার এবং যাত্রাপালায় অভিনয় এবং পরিচালনা করেছেন। সঙ্গীত জগতে বিশেষ অবদানের জন্য তিনি সি. সি. আই পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। তাই 'কৈলাস' সংস্থা তাদের সামাজিক সেবামূলক কাজ ছাড়াও মাঝে মাঝে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে থাকে। এই অনুষ্ঠান করার দুটি উদ্দেশ্য থাকে। একটি মানুষকে নির্মল আনন্দ দেওয়া অপরটি এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 'কৈলাস'-এর

সমাজসেবামূলক কাজের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা।

গত ১লা মার্চ ২০২৬ রবিবার আমরা একটি আনন্দময় অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলাম 'রবীন্দ্র সদন' প্রেক্ষাগৃহে। অনুষ্ঠানসূচিতে ছিল আশি বয়সের উর্দ্ধ তিন কন্যার নৃত্যশৈলী। পরিবেশন করেন শ্রীমতি পূর্ণিমা ঘোষ, শ্রীমতি পলি গুহ এবং শ্রীমতি অলোকানন্দা রায়। এরপরে একক অভিনয়ে শ্রীমতি প্রণতি ঠাকুর নিবেদন করেন মহাভারতের এক অবহেলিতা নারীর শোকবিহ্বল অবলোকন 'ভানুমতি'। সবশযে বিশ্বখ্যাত পার্বতী বাউলের সঙ্গীত।

অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন শ্রীদেবাশীষ বসু। পূর্ণ প্রেক্ষাগ্রহে এই অনুষ্ঠান এক স্মরণীয় স্মারক হিসাবে আমাদের হৃদয়ে লেখা থাকবে।

শেষ করার আগে আমি সকলের কাছে প্রার্থনা জানাই আপনারা আরও আরও এগিয়ে আসুন মহারাজের কাজে। মহারাজের কাজের মধ্য দিয়ে আপনারা আস্বাদন করুন জীবনে ভগবৎ আস্বাদন ও আনন্দ। জয় হোক মহারাজের, জয় হোক ভক্তের, জয় হোক 'কৈলাস'-এর ।

সকলকে জানাই আমার আন্তরিক ভালবাসা।

অর্পণ ব্যানার্জী

প্রকাশক

চিঠি-পত্র

নারায়ণীস্বরূপা গোপা,

১২ .৮. ৭৭

আশীর্বাদ জেন। তোমার চিঠি পেলাম। যাদের পড়াশোনায় মন নেই তাদের Private Tutor বলে যান - আজকের পড়াটা দশবার পড়বে। যার মন সব সময় পড়াতে থাকে তাকে বলে দিতে হয় না কতবার পড়বে বা লিখবে। তেমনি 'জপ'- নামে যে আনন্দ পায় তাকে সংখ্যা নির্দ্দেশ করা নিষিদ্ধ আমি মনে করি। তার যে সাংখ্য (জ্ঞান) জানা হয়ে গেছে সংখ্যায় কি করবে।

শ্লোকগুলি চমৎকার। মন্ত্রশক্তিতে অনেক সহজ করে বক্তব্য। এইসব শ্লোক আমি শিখব। তোমার বাবা বড় পন্ডিত ছিলেন তাই ওমন বিদ্যা পেয়েছ।

প্রশ্নটি চমৎকার। অবশ্যই কীর্তনে বা সভায় উত্তর দেব। তবে উত্তর আমি জানি না। হয়তো ঐ অপরাধে আমিও দোষী। কাজেই সাবধানে আমার ছেলেকে বাঁচিয়ে উত্তর দিতে হবে।

তোমার

মহারাজ

রূপ থেকে অরূপে, অরূপ থেকে রূপে

একথা সত্যি নয় বিবেকানন্দই প্রথম বহির্ভারতে ভারতের অন্তরাত্মার কথা উচ্চারণ করেন । ভারতের সনাতন ধর্মের সংবাদ নিয়ে বিশ্বের দরবারে বিবেকানন্দই প্রথম দূত নন। বিবেকানন্দের পূর্বে ভারতের অন্তরাত্মার সংবাদ তাদের কানে গিয়ে পৌঁছেছিল, কিন্তু প্রাণে গিয়ে পৌঁছয়নি । বিবেকানন্দের পূর্বে রামমোহন রায় গিয়েছিলেন। বিশ্ববিশ্রুত বাগ্মী প্রতাপচন্দ্র মজুমদার গিয়েছিলেন। অ্যানী বেসান্তে থিওজফিক্যাল সোসাইটির কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল আমেরিকার বুকে। এঁরা প্রচার করেছেন, বক্তৃতা করেছেন। তাঁদের কথা শোনাবার জন্য শ্রোতাও পেয়েছেন প্রচুর। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের পার্থক্যও প্রচুর। বিবেকানন্দের আগে যাঁরা গিয়েছেন তাঁরা মাথা নীচু করে বিশ্বের দরবারে প্রবেশ করেছেন। ভারত পৌত্তলিক, কু-সংস্কারগ্রস্থ, এখনও স্বামীর সঙ্গে জ্যান্ত মেয়েদের পুড়িয়ে মারে এই কথা বলতেই তাঁরা গিয়েছিলেন। তাঁরা বলতে চেয়েছিলেন ভারত ভুল করেছে, তোমরা এসে এদের মুক্ত করো। ধর্ম-সংস্কার, সমাজ সংস্কার, শিক্ষা সংস্কার আশু প্রয়োজন এবং মুক্তির উপায় তোমাদের হাতে। ইংরেজ মজা পেয়েছে। তারাই শ্রোতা ডেকে এনেছে ঢাক পিটিয়ে, শোন বিশ্ববাসী শিক্ষিত ভারতবাসী কি বলছে। ওদেরই মুখে শোন ওদের কু-সংস্কারের কথা। কেশব সেন গিয়েছেন। বক্তৃতা করেছেন। কুইনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে হ্যান্ডশেক করেছেন। দেশে ফিরে এসে দেশবাসীর মালা পরেছেন। পেয়েছেন সামাজিক স্বীকৃতি। ইংরেজী শিক্ষার নগদ মূল্য। আর বিবেকানন্দ গিয়েছেন যেন খোলা তলোয়ার। তাঁর মুখে হিন্দুধর্মের মূলকথা শুনে হিন্দুর প্রকৃত পরিচয় জেনে বিশ্ববাসী মুগ্ধ হয়েছে, বিস্মিত হয়েছে। রামমোহন তো বলতে চেয়েছিলেন ইংরেজ এবং ভারতীয়দের মধ্যে বর্ণ-সঙ্কর বিবাহ প্রয়োজন। তাহলে এই পরাধীন দেশে একটা উচ্চতর যোগ্য জাতির জন্ম হবে যারা স্বাধীন ভারত শাসনের ভার নিতে পারবে। তার চিন্তা কত ভুল তা ইতিহাস প্রমাণ করেছে। এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সোসাইটি 'না ঘরকা না ঘাটকা' হয়ে রইল। এর মধ্যে প্রতিভার জন্ম হয়নি তা বলছি না। কিন্তু এই বর্ণ-সঙ্কর প্রতিভা প্রজননের কন্ডিশান নয়। শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব সে যুগের একটা অদ্ভুত বিস্ময়। বিনা আয়োজনে, বিনা বন্দনায়, বিনা ঘোষণায় সূর্য উদয়ের মত তা ধীরে ধীরে রাত্রির অন্ধকারকে কাটিয়ে নতুন প্রভাত এনেছে। আর যত আয়োজন সবই হাজার হাজার বাতি জ্বালিয়ে সূর্যের বিকল্প খোঁজার সদর্প প্রয়াস মাত্র। শ্রীরামকৃষ্ণ সে যুগে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে বেশকার রূপে পুরোহিতের পদে নিজের মনে যখন পূজা করে চলেছেন আর অনবরত গঙ্গা গোমুখের মত কথামৃতের ফুলঝুরি ছড়িয়ে চলেছেন মনের আনন্দে তখন বড় বড় বিদ্বান বুদ্ধিমান কীর্তিমান আপাত-অশিক্ষিত মানুষের মত সমাজ সংস্কারকের দল ধর্ম-সংস্কারে মন দিয়েছেন। তাঁরা সনাতন ধর্মকে 'কু-সংস্কারগ্রস্থ' করতে চান। ডালপালা ছেঁটে মোদ্দা কথাটুকু বলতে চান যেটুকু ইংরেজী চিন্তার সঙ্গে মেলে, পাদ্রীদের বক্তব্যের অনুগ সেটুকুই ভারতের মূল সনাতন ধর্ম বলতে চান।

দেখেছি একই সঙ্গে জন্ম নিয়েছে দয়ানন্দের আর্য সমাজ,রামমোহনের ব্রাহ্ম সমাজ, আগ্রার রাধেশ্যাম সম্প্রদায়, এরা সবাই দেখছি বলতে চান বেদের নিরাকার ব্রহ্মই একমাত্র ধ্যেয়। সাকার উপাসনা অনার্য সংস্কৃতির প্রভাব। মূর্তিপূজা হল পুতুল পূজা। তাঁরা প্রতিমা পূজা বিসর্জন দিয়েছেন। রামমোহন বাড়ির প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহকে অবজ্ঞা করেছেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরবাড়ীর নারায়ণ শিলাকে বাড়ী থেকে বার করে দিয়েছেন। ওটাই ছিল বাহাদুরী। আমি যে শিক্ষিত তার প্রমাণ। দলে দলে মানুষ খৃষ্টান হয়েছে শুধু এইকথা প্রমাণ করার জন্যে যে হিন্দুধর্ম শুধুমাত্র কতকগুলো কু-সংস্কারের সমষ্টি মাত্র। ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ভ্রমণ করে দেখেছি এই যুগে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল অজস্র নতুন ধরণের প্রার্থনা মন্দির। সে মন্দিরের গঠন প্রণালী ছিল গীর্জা বাড়ির অনুকরণ মাত্র। মন্দিরগুলো যেখানে ব্যক্তিগত উপলব্ধির একক আসন পাততে চেয়েছে, এই প্রার্থনা মন্দিরগুলো সেখানে থিয়েটার হলের মত একসঙ্গে বহু শ্রোতার বসার আয়োজন করে দিয়েছে। সারি সারি সাজানো বেঞ্চ কিংবা চেয়ার। ভগবানের বেদীর পরিবর্তে জায়গা দখল করেছে বক্তার বক্তৃতা মঞ্চ। পূজা-আরতি, ভোগ নিবেদনের পরিবর্তে পুরোহিতের কাজ হয়েছে ঘড়ি ধরে বক্তৃতা করা। জপ-ধ্যান-মনন-চিন্তনের বদলে ভক্তদের কাজ হয়েছে নীরবে কান পেতে শোনা। এইগুলো হরিসভায় বসে কীর্তন শোনা বা ভাগবত পাঠ শোনা নয়।

আলোচ্য বিষয়ে পৌরাণিক কবি কল্পনার উল্লেখ নিষিদ্ধ। আদ্দেক বোঝা যায়, আদ্দেক বোঝা যায় না এমনি করে খুব ইনটেলেকচুয়াল করে শুধু এই কথা

বলা যায় যে, তাঁর কথা বাক্য মন অতীত অর্থাৎ আমি বলতে পারছি না অতএব তুমি বুঝতে পারছ না এটা আশ্চর্য নয়। ঘন্টাধ্বনি নেই, ছিঁচকাদুনে কান্নাকাটি নেই, অশিক্ষিত নেটিভের মত হরিধ্বনি চীৎকার নেই, জয়ধ্বনি নেই, নীরবে জুতো পায়ে খস্ খস্ করে শুধু করিডোর দিয়ে হেঁটে যাওয়া।

সেই যুগে রামকৃষ্ণ কিন্তু 'মা' 'মা' বলে কাঁদেন, নাচেন, গান করেন, গান শোনেন, শুনতে শুনতে সমাধি হয়। কোমরে কাপড় থাকে না। ব্যাকুল হয়ে পাথরে মুখ ঘষতে ঘষতে রক্ত পড়ে আবার সাক্ষাৎ মায়ের আদরে বিভোর হয়ে থাকেন। রামকৃষ্ণ প্রতাপচন্দ্রের মতন বাগ্মী নন, রামমোহনের মত লেখক নন, দয়ানন্দের মত সংগঠক নন। সরকার থেকে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত প্রত্যেকে চেনে, জানে কেশব সেনকে, গিরিশ ঘোষকে, যদু মল্লিককে। রামকৃষ্ণ সাধারণ দরিদ্র একজন পুরোহিত মাত্র। নাট্যকার, অভিনেতা, গায়ক নন, অথচ যাঁরা তাঁর গান শুনেছেন তাঁরা বলেছেন তাঁর গান শুনলে আর কারো গান শুনতে ইচ্ছা হয় না। তাঁর শিবের অভিনয় দেখলে মনে হয় সাক্ষাৎ শিব। তিনি যাত্রার আসরে নামলে প্রম্পটার লাগে না। তিনি যা বলেন তাই নাটক হয়ে ওঠে। কীর্তনীয়া কীর্তন গান, রামকৃষ্ণ তার সাথে আখর জুড়ে দেন। সে আখরে মূল পদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি হয়, অন্তর্নিহিত অর্থ প্রকটিত হয় শ্রীরামকৃষ্ণ বাছাই করে নিচ্ছেন। বেছে বেছে কয়েকটা শক্তিশালী চিন্তানায়ককে, যাঁরা বিশ্বাস করেন ঐ আধুনিক সংস্কারবাদী আর্য ব্রাহ্ম সমাজের মত নিরাকার উপাসনায়। বেছে নিয়েছেন কেশব সেন, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, নরেন্দ্রনাথ দত্তকে। তার সঙ্গে একজন সনাতন শঙ্করপন্থী গুরু তোতাপুরীকে। এরা সবাই নিরাকারবাদী, কেউই কালীর ঘরে গিয়ে প্রণাম করতে পর্যন্ত চান না। এত অবিশ্বাস যে মায়ের মুখ দেখেন না পাছে ভাব বদলে যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ তোতাপুরীকে গুরু করেছেন ব্রহ্ম উপসনায় শিক্ষা নিয়েছেন, তিনদিনে ব্রহ্মের উপলব্ধি করেছেন তবু সাকার মা সাকারই থেকে গেছেন। ব্রহ্ম উপলব্ধি

হয়েছে বলে কালীকে টেনে গঙ্গায় ফেলতে হয়নি। এ যেন ব্রহ্মের সঙ্গে বাস করা। তোতাপুরী তিন দিনের জন্য এসে এগারো মাস রয়ে গিয়েছিলেন দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে। তারপর পেটের যন্ত্রণায় গঙ্গায় ডুবে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনবার হেঁটে গঙ্গা পারাপার করেও ডুবে মরার মত যথেষ্ট জল খুঁজে পাননি। তখন ঐ মায়াবী কালীমূর্তির সামনে পড়ে মুক্তি প্রার্থনা করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের কি আনন্দ এ দৃশ্য দেখে।

শ্রীমকে দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ দ্বিতীয় দিন প্রশ্ন করেছিলেন আচ্ছা, তোমার সাকারে বিশ্বাস না নিরাকার? মাষ্টার মশাই অবাক। নিজের মনে স্বগত বলেছিলেন, সাকারে বিশ্বাস থাকলে কি নিরাকারে বিশ্বাস হয়? ঈশ্বর নিরাকার এ বিশ্বাস থাকলে ঈশ্বর সাকার এ বিশ্বাস কি হতে পারে? বিরুদ্ধ অবস্থা দুটোই কি সত্য হতে পারে? সাদা জিনিষ দুধ কি কালো হতে পারে? মুখে বললেন আজ্ঞে নিরাকার, এটিই আমার ভালো লাগে। রামকৃষ্ণ একটি অদ্ভুত উত্তর দিলেন - তা বেশ একটাতে বিশ্বাস থাকলেই হলো। নিরাকারে বিশ্বাস তা তো ভালোই। আবার এ বুদ্ধি কোর না যে - এটিই সত্য আর সব মিথ্যা। এইটি জেন যে নিরাকারও সত্য আবার সাকারও সত্য। তোমার যেটি বিশ্বাস সেইটি ধরে থাকবে। দুটোই সত্য জেনে মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত অবাক হয়ে রইলেন। এই কথা তো তাঁর পুঁথিগত বিদ্যার মধ্যে নেই। তাঁর অহঙ্কার আরেকবার চূর্ণ হোল। কিন্তু সম্পূর্ণ হয়নি। তাই আরেকটু তর্ক করতে গেলেন বললেন, কিন্তু মাটির প্রতিমা তো তিনি নন। রামকৃষ্ণ বললেন, মাটি কেন গো, চিন্ময়ী প্রতিমা। মাষ্টার মশাই চিন্ময়ী প্রতিমা কথাটি বুঝতে পারলেন না, বুঝতে যে পারেন নি সেকথা বুঝতে পারার পর নিজেই তা লিখে গেছেন কথামৃতে । বললেন, আচ্ছা যারা মাটির প্রতিমা পূজা করে তাদের তো বুঝিয়ে দেওয়া উচিত যে মাটির প্রতিমা ঈশ্বর নয়, মাটিকে পূজা করা উচিত নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন তোমাদের কলকাতার ঐ এক। কেবল লেকচার দেওয়া আর বুঝিয়ে দেওয়া। তোমাকে কে বোঝে তার ঠিক নেই, তুমি বোঝাবার কে ? যাঁর জগৎ তিনি বোঝাবেন।

কেশব সেন রামকৃষ্ণকে ভালবেসেছেন। রামকৃষ্ণ ভালবেসেছেন কেশব সেনকে। রামকৃষ্ণ লীলা সংবরণের ১২ বছর আগে কেশব সেন এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে। তাঁর আগমনের আট বছর পর এসেছেন নরেন্দ্রনাথ আর মাষ্টারমশাই চার মাসের ব্যবধানে। ব্রাহ্ম সমাজের চিন্তায় আর বেদান্ত সমাজের ব্রহ্ম চিন্তায় একটি মূল পার্থক্য এই যে বেদান্ত বলে নির্গুন নিরাকার। কিন্তু ব্রহ্ম চিন্তা বলে তিনি নিরাকার কিন্তু সগুণ। তিনি দেখতে পান, শুনতে পান, কাছে আসেন, ধরা দেন, প্রার্থনা পূরণ করেন, প্রেমময়, স্নেহময়, দয়াময় কিন্তু নামও নেই আকারও নেই। শ্রীরামকৃষ্ণ তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেন না। বরং ওরা যখন প্রার্থনা করে তখন তিনি শোনেন। বিশেষ করে তাঁর সামনে কেশব সেন একটু বক্তৃতা করেন এটা তিনি পছন্দ করেন, আবার ভুল ধরতেও ছাড়েন না। পাক্কা মাষ্টার। কিন্তু ভুল ধরার কায়দাটা এত সুন্দর, এত মার্জিত, এত গভীর, এত নির্ভুল যে, যে কেশব সেন হাসিমুখে তাঁর নিজস্ব ধারণাকে বদলে নেন সকৃতজ্ঞ চিত্তে। একদিন দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গার সিঁড়ির ওপরে চাঁদনীর কাছে কেশব সেন বক্তৃতা দিচ্ছেন। ব্রাহ্মসমাজের অনুগামীরা মুগ্ধ হয়ে শুনছে। শ্রীরামকৃষ্ণ শুনছিলেন হঠাৎ উঠে গেলেন। সবাই ভাবলো রামকৃষ্ণ এসব বুঝতে পারছেন না বলে উঠে গেলেন। একথা বলতেও তারা ছাড়ল না। কিন্তু কেশব সেন শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন কিছু কি ভুল বলেছি? শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন তুমি তাঁর ঐশ্বর্যের কথা বলছিলে, তাঁর কত আছে, কি আছে এই সব।

বড়লোক মা-ই কি শুধু মা, গরীবের মা কি মা নয়? ঐশ্বর্যই তাঁর একমাত্র পরিচয়? এ কথায় হার মানতে কি আনন্দ! আরেকদিন কেশব সেন শ্রীরামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনার মন্দিরের মধ্যে ঐটুকু মা তিনি সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মান্ড চালাচ্ছেন কি করে? শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন ঐটুকু সূর্য এত বড় পৃথিবীকে আলো দিচ্ছে কি করে? কেশব সেন বলেন, সূর্য ঐটুকু নয়, পৃথিবীর চেয়ে অনেক বড়। রামকৃষ্ণ বলেন, তাহলে ঐটুকু দেখাচ্ছে কেন? কেশব সেন বলেন, পৃথিবীর থেকে দূরে আছে কিনা তাই ছোট দেখাচ্ছে । শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, আমার মা-ও ঐটুকু নয়। তুমি ওর থেকে দূরে আছো কিনা তাই ছোট দেখছ। এমনি করে শ্রীরামকৃষ্ণ সাকার উপাসনার মহিমা প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। নরেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম সমাজের কর্মী। ব্রাহ্ম চিন্তায়

বিশ্বাসী। জন্মগতভাবে বৈদান্তিক। উনিও কালীর ঘরে যেতে চান না । কিন্তু পিতৃশোক দিয়ে, আর্থিক অনটনে ফেলে শ্রীরামকৃষ্ণ ঐ মায়ের মূর্তির সামনে এনে ফেলেছেন নরেন্দ্রনাথকে। মা-ভাইবোনের অর্থকষ্টে জর্জরিত হয়ে ঠাকুরের কাছে গিয়েছেন। ঠাকুর এগিয়ে দিয়েছেন মায়ের মূর্তির সামনে। মার কাছ থেকে তুই নিজে চেয়ে নে না। চাইতে গিয়েছেন, মূর্তির সামনে দাঁড়িয়েছেন। চিন্ময়ী প্রতিমা কি বুঝেছেন, চাইলে পাওয়া যায় বুঝেই সামান্য বস্তু চাইতে পারেন নি। বিবেক, বৈরাগ্য জ্ঞান চেয়েছেন। বার বার তিনবার গিয়েছেন, প্রার্থনা বদলাতে পারেন নি। কিন্তু এই ঘটনা তাঁর অন্তরে সাকার মূর্তি উপাসনার প্রথম বীজ অঙ্কুরিত করেছে। তার চরম পরিণতি দেখেছি শ্রীরামকৃষ্ণ অপ্রকট হবার পর বিবেকানন্দ অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলেছেন, ঠাকুর আমাদের ভবতারিণীর কাছে সঁপে দিয়ে গেছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অপ্রকট হবার পরও এই কথাটি শোনা গিয়েছিল। তাঁর আপনজনেরা বলেছিলেন প্রভু আমাদের জগন্নাথের হাতে সঁপে দিয়ে গেছেন। এখানে বিগ্রহ এবং যাঁর বিগ্রহ তাঁরা এক হয়ে গেছেন। প্রতীক আর প্রতীতি এক হয়েছে। বিদেশ থেকে ফিরে এসেও বিবেকানন্দ চাননি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতি পূজিত হোক অথচ শ্রীশ্রীমার নির্দেশে তাঁর এতখানি পরিবর্তন ঘটেছিল যে তাঁর সবটুকু বিশ্বাস এবং ভক্তি দিয়ে তিনি রামকৃষ্ণের যে মূর্তি বেলুড় মঠে প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন তা সকল অবিশ্বাসীর পক্ষে মূর্তিমান প্রত্যয় মূর্তি। ভক্তির শীতল স্পর্শে জল জমে বরফের আকার নেয় জ্ঞান সূর্যের সপ্ত রশ্মিতে বরফ গলে জল হয় একথা স্বামীজী জানতেন বলেই বিশ্ববাসীর সামনে ভারতের অন্তরাত্মার কথা এত ভিন্ন সুরে বলেছিলেন।

—স্বামী শিবানন্দ গিরি

আমার দর্শন - স্বামী শিবানন্দ গিরি

খালি পায়ে ভারতদর্শনে বেরিয়ে সোমনাথে গিয়ে পৌঁছেছিলাম। ইতিহাসে পড়ে সেই সোমনাথের বিখ্যাত মন্দির। সমুদ্রের ধারে বিরাট মন্দির। পাথরে বাঁধান প্রাঙ্গন তেতে ছিল। পায়ের তলা জ্বলে যাচ্ছিল। তার চেয়ে বেশী জ্বলছিল মনটা। মন্দির সংস্কারের নামে গুজরাটি মারোয়াড়ি লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নতুন করে মন্দির তৈরী করেছে। তৈরী করেছে তোরণ, নহবৎখানা। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নতুন শিব, নিত্য সেবার ব্যবস্থা। মানতে পারছি না। কোথায় গেল সেই ঐতিহাসিক ভাঙ্গা টুকরোগুলো? চারিপাশে সাজানো নকল পাহাড় যেন কাঁদছে। একটু গলিপথে মিউজিয়াম নামক একটা বস্তির মধ্যে ইতস্তত ছড়ানো আমার প্রাণের টুকরোগুলো খুঁজে পেলাম। অনেকক্ষণ ধরে ওদের সঙ্গে কথা বললাম। ওদের কথা শোনবার চেষ্টা করলাম। অনেক দেরী হয়ে গেল। সামনে লঙ্গরখানায় ততক্ষণে ভিখারী সাধু সন্ন্যাসীর ভিক্ষা হয়ে গিয়েছে। এঁটো পাতা ঝাঁট দিয়ে ফেলছে। সবাই বলল, একটু এগিয়ে যাও। একটু আগেই প্রভাসক্ষেত্র। চমকে উঠলাম, বলে কি? সোমনাথ প্রভাস এক জায়গায়?

বড় লাঠিটা বাগিয়ে ধরে এগিয়ে চললাম। একটুখানি যেতেই পেলাম প্রভাসক্ষেত্র। কোনও তোরণ নেই, সৌধ নেই। এমন কি ভগ্নাবশেষও নেই। চারিপাশ ফাঁকা। সমুদ্রের জল অনেকখানি মাটির ওপর উঠে এসেছে। সেই অল্পজলের মাঝখানে শুধু একটা ঘাট দেখা যাচ্ছে। ঘাটের আগে পেছনে জল খুব পুরনো বড় বড় পাথর বসানো। হাঁটুজল ভেঙে ঘাটে উঠে ঘাটকে প্রণাম করলাম। হাজার হাজার বছরে সমুদ্রের নোনা জলে ক্ষয়ে যাওয়া কুকড়োন পাথরের ওপর খালিগায়ে গড়াগড়ি দিতে লাগলাম। মনে পড়ছে, এই সেই প্রভাসের ঘাট যেখানে শ্রীকৃষ্ণ তীর্থমানসে মহিষীদের নিয়ে এসেছিলেন। যেখানে এসে সাক্ষাৎ করার জন্যে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতিকে রথ পাঠিয়েছিলেন বৃন্দাবনে। শ্রীকৃষ্ণের রথ ফিরিয়ে দিয়ে আরও দ্রুতগতিতে আসার জন্যে মনোরথে রাধা এই প্রভাসে এসেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের কাছে যান নি। দূর থেকে শ্রীকৃষ্ণকে দেখেছিলেন। এই সেই ঘাট, যেখানে শ্রীকৃষ্ণের চোখের সামনে তাঁরই সন্তান যদুবংশ মদ খেয়ে মাতাল হয়ে নিজেদের মধ্যে মারামারি করতে করতে সলিল সমাধি লাভ করেছিল। এই সেই ঘাট, যেখানে শ্রীকৃষ্ণের অবর্তমানে আক্রমণকারী দস্যুদের হাত থেকে শ্রীকৃষ্ণের মহিষীদের অর্জুন রক্ষা করতে পারেননি। গান্ডীব পর্যন্ত তুলতে অক্ষম হয়েছিলেন। অসহায় মহিষীরা বাধ্য হয়েছিলেন এই ঘাটে আত্মবিসর্জন দিতে।

আমার পাগলপনা চালচলন দেখে এক শিবভক্ত আমায় বললে, আরে শিউজীকা বেটা, থোড়া আগে বাঢ়ো। তোমার কৃষ্ণকে ঐখানেই কদম্বের গাছে ব্যাধে তীরবিদ্ধ করে মেরেছিল। আরও বিস্ময়ে, পড়ি কি মরি করে সমুদ্রের অল্প জলে এলোমেলো পা ফেলে

ছুটলাম। গিয়ে দেখলাম সেই কদম্ববৃক্ষ। মাথা ঠুকলাম সেই কদম্বের পায়ে। সামনে একটুখানি চৌকো জায়গা ইটের পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। মাঝে একটা তুলসী গাছ। বললে, এইখানে তোমার কৃষ্ণকে দাহ করা হয়েছিল। আমি মুঠো করে ধুলো নিয়ে কপালে বুকে মাখতে লাগলাম। দেখলাম পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে গোমতীর কালো জল। এ শ্মশানে আর শবদাহ হয় না । সব শেষ হয়ে গেছে। এ নদীর ধারের পাঁচিলটা নিমতলা শ্মশানঘাটের মত। আমার অনুভূতি একাকার হয়ে গেল। তারপর কি হল জানিনা।

কতবার এই কথা ভেবেছি। অনেকগুলো প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাইনি। বৃন্দাবন ছেড়ে আসার পর শ্রীকৃষ্ণ পায়ের নুপূর খুলে ফেলেছিলেন। রাজারাজড়ারা এক ধরণের জুতো পরতেন বলেই জানি। দ্বারকাধীশকে নতুন করে কদমগাছে উঠতে দেখলো সবাই, অথচ তাঁর সামন্তরা তাঁকে একলা ছেড়ে দিল? এমন মধুর দৃশ্য তারা দেখল না? শুধু ব্যাধ দেখেছিল তাঁর টুকটুকে রাঙা পা দু'টো। যেমন অর্জুন দেখেছিল, মাছকে বাদ দিয়ে মাছের চোখের তারাটি। সন্ধানীকে একটি বিশেষ বিন্দুতে দৃষ্টি সংক্ষেপ করতে হবে। এইটিই কি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত? কোনও গ্রন্থে এর জবাব পাইনি আজও। চূড়া বাঁশি তো শ্রীকৃষ্ণ মথুরা আসার পথে ব্রজধামেই ফেলে এসেছিলেন। হ্যাঁ গো, শেষের দিনে চূড়া বাঁশী কোথায় পেলে? কে এনে দিল? তুমি যাকে রথ পাঠিয়েছিলে, সে তো রথ ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিল। মনোরথে এসে দূরে দাঁড়িয়েছিল। বল না কৃষ্ণ, কখন তোমায় সাজাল? জীবনের শেষ মুহূর্তে আবার সেই বেণুঅধর পীতধর নটবর বেশ। বলবে? ছেলেগুলো জলে ডুবল, মহিষীরাও আত্মবিসর্জন দিল। ব্যাধ কাঁদল। কৃপাসিন্ধু তাকে এই নিঠুর কাজ দিয়ে জগতের কাছে ছোট করলে কেন? তারও কৈফিয়ত তুমি দিয়ে গেলে। কিন্তু রাধা যে এল, সে গেল কোথায়? শুনেছি বৃন্দাবনে তুমি তোমার হৃদয়খানা রেখে এসেছিলে, তুমি ছিলে হৃদয়হীন। রাধা এসেছিল নিজের হৃদয়খানা ধার দিতে। ধার নিয়ে তুমি তো শোধ দাও না শুনেছি। ভক্তের কাছে চিরদিন ঋণী থাকতে চাও। চেওনা দিনে দিনে সে ঋণ শোধ হয়ে যাক। তাই চৈতন্য হয়ে এসে আমাদের চৈতন্য দিয়ে গেলে। রাধার ঋণ চোখের জলে শুধতে এসে শুধু ঋণ বাড়িয়ে গেলে। বলে গেলে জনম জনম কাঁদতে চাই।

—স্বামী শিবানন্দ গিরি

একটি পুনরালোচনা

তোমার কাছে শেখা, তোমার কথা লিখতে গেলে জ্ঞান লাগে না, বিদ্যা লাগেনা। শুধু তাঁর কৃপা পেলেই শেখা যায়। তাই ঠাকুরের কাছে নিবেদন করি, ঠাকুর তুমি আমায় কৃপা কর। আমি যেন তোমার কথা ঠিক 'তেমনি তেমনি তেমনি করে,; যেমনি করে তুমি আমাদের কাছে এসেছিলে, যেমন করে তুমনি আমাদের মাঝে বিরাজ করেছিলে, ঠিক তেমনি করেই যেন আমি ফুটিয়ে তুলতে পারি। তোমার কৃপা আমার একমাত্র ভরসা।

ঠাকুরকে স্মরণ বন্দনা করতে বসে দেখি, স্মৃতির দৃশ্যপট আমার 'নিথর তাহা শ্রীশ্রীঠাকুরের কীর্তনের ভাষায় বলি, ''ওগো মাটির প্রতিমা, কথা কও, সাড়া দাও। কও কথা কও। জাগো ভগবান। এসো গো আমায় জাগিয়ে দাও। নীরব হয়েছে 'ভাষা; কহে না কথা।

ঠাকুর ছেলেবেলায় দুই হাতে দুই থালা নিয়ে গাইতেন, 'খাবি আয় মা। খাবি আয়। আর গাইতেন 'জয় মা জয় মা, মা মা বলরে। তারপর বয়স বাড়ার সাথে সাথে ক্রমশঃ কীর্তন গাইতে শুরু করলেন। ঠাকুর কীর্তনের আসরে মুখে মুখে কীর্তন রচনা করে গাইতেন। তাই প্রতিদিনই নূতন নূতন পদ রচিত হতো। যতদূর সম্ভব আমাদের দাদু ডঃ সুধাংশু কুমার গুপ্তের আদেশে ঠাকুরের কীর্তনের কথা লেখা হত। সেই সময়ে সকলের মধ্যে বিদ্বান, বুদ্ধিমান বলতে নিমাইদা'ই ছিলেন। তাই নিমাইদার উপরেই ঠাকুরের কীর্তনের কথা লেখার ভার ছিল। ক্রমশ তারপর যতীনদা কীর্তনের কথা লিখতে শুরু করলেন। হালসীবাগানের অগ্নিকান্ডে সতীশদার পা ভাঙ্গার পর যখন হাসপাতালে ছিলেন তখন থেকে নন্দদা অর্থাৎ সুবোধ সেন কীর্তনের কথা লিখতে শুরু করতে থাকেন।

আমার বড়দা শান্তিময় ভট্টাচার্য আমাকে কতকগুলি শ্রীশ্রীঠাকুরের কীর্তনের খাতা দিয়েছেন পাঠ উদ্ধার করার জন্য। ঐ খাতাগুলিতে ১৯৪২ সাল থেকে ১৯৪৯ অবধি ঠাকুরের কীর্তনের কথা লিপিবদ্ধ আছে। কীর্তনের মাঝে মাঝে ঠাকুরের ভাবের কথা কিছু লেখা আছে এই খাতাতে। এখানে আলোচনার

বিষয়বস্তুটি হল ঠাকুরের মাঝে মাঝে যে ভাবের উদয় হতো, ভাবে বিভোর হয়ে যা বলেছিলেন সে বিষয়ে বলব। সময়টা ছিল হালসীবাগানের অগ্নিকান্ডের পরে। হালসীবাগান থেকে কালীমাতাকে বিডন স্ট্রীটের বাড়ীতে নিয়ে এসেছিলেন। হালসীবাগানের বাড়ীতে ঠাকুর মনের মত করে আনন্দ আশ্রমকে সাজিয়েছিলেন। বাড়ীটা ছিল ভাড়া বাড়ী। কিন্তু ঠাকুর প্রতি বছর কালীপূজার আগে রঙ করাতেন। তার জন্য হালসীবাগানের বাড়ীওয়ালা ঠাট্টা করে বলতেন, তোমার মেমসাহেবকে তুমি যদি নতুন নতুন গাউন পরাও তো আমার কি বলার থাকতে পারে।

হালসীবাগানের অগ্নিকান্ড কালীপূজার পরের দিন

রবিবার বিকাল বেলা ৮ই নভেম্বর '৪২তে হয়। রাত্রি ১১টায় ঠাকুর বিডন ষ্ট্রীট চলে এলেন। ২০শে নভেম্বর ৪২ শুক্রবার রাত্রে সন্ধ্যা ৭টা থেকে নটা পর্যন্ত ঠাকুরের ভাব হয়। মা কালীর সিংহাসনে কালী মায়ের সামনে তিনখানা বাল্ব হঠাৎ একসঙ্গে ভেঙ্গে যায়। সেই ছোট দীপের আলোর ভেতর হালসীবাগানের আগুনের শিখা ঠাকুরের চোখের সামনে জ্বলে ওঠে। তাই বাল্ব ভাঙ্গার প্রসঙ্গে - তিনটে বাল্ব ভেঙ্গেছে বলে আমি বিচলিত হয়েছিলাম এ যারা ধারণা করেছে, তাদের ধারণা কত ভ্রান্ত। রাজার ঐশ্বর্য পুড়ে গিয়েও যে নির্বিকার থাকতে পেরেছে, আর সামান্য তিনটে বা ভাঙ্গাতে তার বেশী কি ক্ষতি করেছে। যাতে তিনি বিচলিত হবেন!

-ঐযে কালী মূর্তি - ওতো শুধু ছবির পট নয়। ওযে জ্বলন্ত অগ্নিশিখা। এর পরিচয় আমি তো বহুবার পেয়েছি। দেখিয়েও দিয়েছি। ওর পূজার অনাচার সহ্য হয় না। অনাচার, অনাদর জমে উঠে ওর অসহ্য হয়ে উঠেছিল তাই সে মূর্তিমতি এসে জ্বালিয়ে দিয়ে গিয়েছে। সেই মূর্তি আজ এবাড়ী এনে প্রতিষ্ঠা করেছি। যেখানে রেখেছি তাঁকে, সেই ঘরের বাল্ব যখন ভাঙ্গলো, তখন মনে হল এখানেও কি অনাদর, অনাচার এসে পৌঁছেছে, যার জন্যে আবার এই ক্ষতি। তাই হয়েছিলাম বিচলিত। ঠাকুর ভাবে বিভোর হয়ে মনের আবেগে বলে চললেন, একদিন যে নিজে চক্র ঘুরিয়ে এসেছে, সকলের অমঙ্গল কাটিয়ে মঙ্গল করে এসেছে, আজ মাথায় তার চক্র। চক্র সে তার মাথায় নিয়েছে নিজেরই চক্র হিসাবে। তাতে সে সর্বহারা। সকলের দুঃখ, সকলের ব্যথা, সকলের সব বিপদ এতদিন কাটিয়ে এসেছে। কিন্তু বিপদ দুঃখ সবকিছু আজ নিজের মাথায় করে নিয়েছি। কিন্তু যারা বিশ্বাস করে এসেছে, সে সব কিছুই তাঁরই দান, সে বিশ্বাস তাদের যেন থাকে অটুট। বিশ্বাসই বড় জিনিষ। বিশ্বাস হারালে তার সব কিছুই যায়।

আজ নিজে আমি 'দাস'। বার বার তাঁকে পূজা করে এসেছি। অবজ্ঞা করে। 'সোহং' অর্থাৎ সেই আমি। এবং আমিই সেই এই ভাবে। তাঁকে আজ্ঞা করে এসেছি, কারও অসুখ সারিয়ে দাও। কাউকে অর্থ দাও। কারও অশান্তি দূর করে তাকে শান্তি দাও। তিনি আমার সব কথাই শুনে এসেছেন। কিন্তু এক বৎসর যাবৎ আমার পদ্ধতি বদলে ছিলাম আমি 'দাসরূপে তাঁকে পূজা করে আসছিলাম। তাঁকে আর জানাইনি কারও কথা। আজ সর্বহারা হয়েও তাঁকে একবারও জানাচ্ছি না যে - আজ আমার এ বিপদ দূর করো। আমার মান বজায় রাখো। আজ আমি যে দাস। তাঁর ইচ্ছা পূরণ হতে দেওয়াই আমার কাজ। আমি দেখব এ দাস্য পূজার শেষ কোথায়? কি এর শেষ ফল? আমি জানি তিনি আমার ভেতরে। আমার কাজের ভেতরেই জড়িয়ে আছেন। তাই আজ লোক নিন্দা, লোক দোষ অপবাদ সব সহ্য করে যেতেই হবে। কারণ জানি সবই তাঁর ইচ্ছা। আর আমি তাঁর 'দাস'। এতে আমাকে সব যদি হারাতে হয়, যদি সন্ন্যাসী হয়ে সব ছেড়ে চলে যেতে হয়, তাও স্বীকার। তবু আমি তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই প্রতিবাদ করব না। করতে পারব না। এতদিন সকলের মঙ্গলামঙ্গল নিজের ওপর নিয়ে, সকলকে নিয়ে জড়িয়ে ছিলাম। আজ আমি মুক্ত। আজতো কারও ভার নিজের ওপর রাখিনি। রাখতে পারিনি। কারণ আজ যে আমি দাস।

তবে আমি জানি, যাকে আমি ভালবাসি, যার আমি 'দাস সে দেখবে আমাকে। রাখবে আমার মান। আমাকে দেখতে হবে কেন? আমি সেই আছি। আছে আমার 'রুদ্র তেজ'। ভেতরে জ্বলন্ত শিখা। কিন্তু তার পরিচয় আমাকে দিতে হবে কেন? কতকগুলো রাস্তার

কুকুর চেঁচাচ্ছে বলে। তাদের বিরুদ্ধে আমাকে দাঁড়াতে হবে কেন?

আগুন যে জ্বলেছে। সে তাঁরই কাজ। তিনি নিজে এসেছিলেন আগুন জ্বালাতে। আগুন নিয়ে ধেই ধেই করে খেলা করে গেছেন। তিনি না এলে ওভাবে পুড়তেই পারে না। নিশ্চয়ই তাঁরই কাজ। তাই আমাকে তাঁর দান মাথা পেতে নিতেই হবে। হয়েছিলো তাঁর অসহ্য অনাদর, অনাচার। তিলে তিলে জমে। তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছিলো এ সহ্য করা। তাই তিনি নিজে এসে নিজে হাতে জ্বালিয়ে দিয়ে গেলেন। এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

যখন হোমের আগুনে পুড়ে গিয়েছিলাম, তখন দেখেছিলাম তাঁর চোখে জল। আর আজ এই যে বিরাট অগ্নিকান্ডে এতগুলো প্রাণ যে বলিদান, কই তাঁর চোখে তো একটুও জন দেখতে পাচ্ছি না। মুখ তো কই একটুও ম্লান দেখিনা কেন? এর কারণটা আজ পর্যন্ত অজ্ঞাত। বুঝে উঠতে পাচ্ছি না। আজ যেন দেখছি তাঁর ভাব - করেছি বেশ করেছি। কিন্তু কেন? কি অনাচার? কার অনাদর? যার জন্য তাঁর এই তান্ডব লীলা।

তিনি নিজে আমায় ভালবেসেছেন। আমি তো আগে তাঁকে ভাবতে যাইনি। ভালবাসতে যাই নি। তিনি এসেছিলেন আমার কাছে। আমাকে জানিয়েছেন তিনি। আমার ভেতর থাকবেন তিনি চিরকাল। আমি যে অবস্থায় থাকি না কেন, কেন তিনি তাঁর স্থান জ্বালালেন, কেন তাঁর সিংহাসন পুড়িয়ে দিলেন। এর মীমাংসা এখনও করে উঠতে পারিনি। তবে বার করতে হবে। দোষ তো আমার নয়। আমি তো কোন কাজ তাঁকে না জিনিয়ে করিনি। তাঁর অনুমতি ভিন্ন কোনদিন কোন কাজে হাত দিইনি। লোকের উপকার ভিন্ন কোনও দিন কারও অপকার করিনি। নিরন্নকে অন্নদান, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দান এই তো চিরকাল করে এসেছি। তাতে দোষ কোথায়? তবে কার দোষ? যার জন্য এত লোকের আজ সর্বনাশ হলো।

এতেও তাঁর উদ্দেশ্য দেখতে পাচ্ছি। মনে হয় নিভে যাচ্ছিলাম। ভেতরের প্রখর অগ্নিশিখা। রুদ্রতেজ নিস্তেজ হয়ে আসছিল। তাই তিনি জাগিয়ে দিয়ে গেলেন। এবার জেগেছি। আর জেগেই থাকবো।

(শ্রীশ্রীঠাকুর বিশ্বনাথ দেবের কীর্তনের খাতা থেকে ১৯৪২)

মধু-বৃন্দাবনে

হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে । হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম হরে হরে।।

আনন্দ রূপে এসো আনন্দময়।

যত লাজ ভয় অপমান কর গো জয়

আজ মধু বৃন্দাবনে, আজ মধুর যমুনার তীরে মধুর মলয় পবন বয়ে যায়। বৃন্দাবনে যমুনা বয়ে যায়, যমুনা বয়ে যায়- কত কথা কয়ে যায়। যমুনার তীরে মলয় পবন বয়ে যায়, তমাল তরুয়া দাঁড়ায়ে থাকে। সেই যমুনার তীরে তীরে কাঁদে গোরা রায়। ভাবের দোলাতে ব্যাকুল চিত্তে যমুনার তীরে তীরে গোরাচাঁদ আমার রাধা রাধা বলে। পদকর্তা ভাব নেত্রে দেখছেন- শ্রীমন মহাপ্রভু যমুনার তীরে রাধা রাধা বলে যেন বাঁশিটি বুকে নিয়ে, পদকর্তা বর্ণনা করছেন-

চলিতে পারেনা গোরা কাঁপে সারা অঙ্গ, আয় তোরা দেখে যারে সোনার গৌরাঙ্গ । বলি রাধা নামে বুক ভেসে যায় ।

জয় রাধে, জয় রাধে বলে

রাধা নামে বুক ভেসে যায়-

সে যে রাধা নামে, প্রভু আমার কাঁদছেন, যত কান্না রাধারাণী কেঁদেছেন । যত কান্না রাধারাণী কেঁদেছেন সেই কান্নার ঋণ শোধ করতে যেন প্রভু আমার নেমে এসেছেন । আর মহাপ্রভু কি- গৌর আমার একা নাম করছেন! না-গো-না বৃন্দাবনের যমুনা সে যে কৃষ্ণ নাম করে, বৃন্দাবনের ধূলিকণা সে যে কৃষ্ণ নাম করে, বৃন্দাবনের তরু-গুল্মলতা সে যে কৃষ্ণ নাম করে। তারা কৃষ্ণ কথা শোনে, তারা কৃষ্ণ নাম শোনে। তারা কৃষ্ণ কথা বোঝে। তাই চল চল সেই বৃন্দাবনে যাই। সকলে মিলে বৃন্দাবনে যাই। যে বৃন্দাবনে আজও বাঁশি বাজে, আজও যমুনা তেমন করে বয়ে যায়, আজও বৃক্ষ-লতা, আজও ধূলিকণা-সে জীবন্ত সত্তা, আহ্বান করে আয় আয় বলে। তাই বলছে-চলো হামভি চলো, চলো তুমভি চলো। চলো সাধু যেইসে, চলো মুনী যেইসে। চলো যমুনা যেইসে, চলো গঙ্গা যেইসে।

উসি রংসে চলো, উসি ঢং সে চলো।।

কিন্তু বৃন্দাবনে যাবো বললেই কি যাওয়া যায়? এত সহজ? নরোত্তম দাস ঠাকুর বলছেন- মধুর বৃন্দা বিপিন মাধুরী প্রবেশ চাতুরী সার। বৃন্দাবনে যেতে গেলে চতুরালী দরকার। যে জন চতুর ভজে সে বড় চতুর। চাতুর্যের প্রয়োজন। বৃন্দাবনের মাধুর্য্য আস্বাদন করার জন্য চাতুর্য্যের প্রয়োজন। বৃন্দাবন মধুর কিন্তু সকলের ভাল লাগেনা। ন্যাবা হলে মিছরি খেতে ইচ্ছা করে না। কবিরাজ বলে খাও খাও, খেতে খেতে মিষ্টি লাগবে। তেমনি বনতে বনতে বন যাই। নাম করতে করতে দেখ তোমার ভেতরে আত্মা জাগ্রত হবে। সে পরমাত্মার সঙ্গে মিলতে চাইবে। আর তখনই আনন্দ। আর সে আনন্দ, নরোত্তম দাস ঠাকুর বলছেন-

মধুর বৃন্দা বিপিন মাধুরী প্রবেশ চাতুরী সার। বলি ব্রজের যুবতি ভাবের ভকতি শকতি হইত কার বলি গাও গাও পুনঃ গৌরাঙ্গের গুন সরল করিয়া মন, ভাবিয়া দেখিনু এ তিন ভুবনে এমন নাহিক জন। এমন হয় নাই হবার নয়।

কলির ভাগ্যে হয়ে ছিল হয় নাই হবার নয়।

মোদের ভাগ্যে হয়ে ছিল হয় নাই হবার নয়।

মধুর বৃন্দাবনে গোরাচাঁদ আমার আপন পরিকরদের সঙ্গে প্রবেশ করছেন। আর গোরাচাঁদ সকলকে বলছেন- ধীরে চলো, আওয়াজ কোরোনা, গোলমাল কোরোনা, রাধা কৃষ্ণের নিত্য লীলা বিঘ্নিত হবে। বৃন্দাবনে তুমি দর্শনার্থী হয়ে এসো না। বৃন্দাবনে এসো বৃন্দাবনের একজন হয়ে। পারলে ঐ ধূলিকণার সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে নাও। না-না ধূলিকণা গায়ে মাখতে নয়, ধূলিকণার সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে নাও। যমুনার এক কণা বারি বিন্দু হয়ে যাও। তমাল-তরুয়া, তৃণ-গুল্ম রাজি বৃক্ষলতা তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাও। বৃন্দাবনের আকাশ, বৃন্দাবনের চাঁদ তার সঙ্গে মিশে যাও। ঐ নিজেকে,যন্ত্রনা-শোকে গলিয়ে ফেল। নিজেকে ভুলিয়ে ফেল। যদি বল যন্ত্রনা সহ্য করতে পারছি না, তাহলে যন্ত্রনা হবে না এমন এক যন্ত্র তোমার কাছে আছে এবং এমন এক মন্ত্র তোমার কাছে আছে। সে যন্ত্র ভগবান সবাইকে দিয়েছেন, তার নাম হৃদয় যন্ত্র। আর সেই হৃদয় যন্ত্রে মন্ত্রটি কৃষ্ণ নাম। কৃষ্ণ নাম হৃদয় যন্ত্রে ধ্বনিত কর, দেখবে তুমি মিশে যাচ্ছ, তুমি একাত্ম হয়ে যাচ্ছ। মনে হবে বৃন্দাবনের একটা অংশ তুমি। দেখ-নিজেকে এ ভাবে মিশিয়ে দিতে পারবে। সকল অহংকার হে আমার ধোয়াও চোখের জলে। যখন মিশিয়ে দিতে পারবে তখন দেখবে তুমিও বাঁশি হয়ে বাজছ। আর তখন সে আনন্দ, সে উত্তরণ, সে আস্বাদন, গাও গাও- কৃষ্ণ নাম তোমাকে মিশিয়ে দেবে, মিলিয়ে দেবে। তোমার মনে হবে আমি সকলের নয়, আমি তোমাদের নয়, আমি শুধু তোমার প্রভু। এই একাত্মতা যখন অনুভব করবে তখন দেখবে তোমার অঙ্গে অঙ্গে কে বাঁশি বাজাবে।

হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম হরে হরে।।

মহাপ্রভু ষড়-গোঁসাইকে আদেশ করলেন- তোমরা যাও বৃন্দাবনে, লুপ্ত বৃন্দাবন উদ্ধার কর। এত জায়গা থাকতে বৃন্দাবন কেন? ব্রহ্মান্ডে যত জায়গা আছে তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জায়গা হল পৃথিবী। সাধনা করার জায়গা, সাধন করার জায়গা। দেবতারা যে যার জায়গায় নিজের কাজ করছেন, কিন্তু সাধনা করতে হলে তাদের পৃথিবীতে নেমে আসতে হয়। ভগবানকে সর্বোত্তম রূপে পাওয়া যায় মানুষের মধ্যে। সর্বোত্তম নর লীলা। স্বামিজী বলছেন- আমি সেই ভগবানকে পূজা করি যাকে আহাম্মকরা মানুষ বলে। আর পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ জায়গা হচ্ছে বৃন্দাবন, যেখানে কৃষ্ণগত প্রাণ গোপীদের বাস।

রাধা কুন্ড, শ্যাম কুন্ড, গিরি গোবর্ধন,
মধুর মধুর বংশি বাজে এইতো বৃন্দাবন।

তার নীরব প্রবেশ। বৃন্দাবনে বাস এই অভিলাষ। কৃষ্ণ পূর্ণ, কৃষ্ণের লীলাও পূর্ণ আর লীলা যে দেখছে তিনিও পূর্ণ। কৃষ্ণ পূর্ণ, রাধারাণী পূর্ণ, রাধা-কৃষ্ণের যুগল তনু পূর্ণ। কৃষ্ণ লীলায় কমা-ফুলস্টপ নেই-

পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে,
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।
সেই বৃন্দাবনে চল যাই।
হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম হরে হরে।।
হরি বোল, হরি বোল, হরি বোল।
জয় বিশ্বনাথের জয়, জয় বিশ্বনাথের জয়,
যাহার চরণ কমল পরশে সকল কলুষ বিনাশ হয়।।

শনিবারের কীর্ত্তন

পাঁচ সিকে পাঁচ আনা

'কৈলাস'-এর প্রকাশনায় 'পাঁচ সিকে পাঁচ আনা' নামে একটি বই প্রকাশিত হয়েছে। স্বামী শিবানন্দ গিরি মহারাজের তত্ব এবং তথ্য সম্বলিত এই অসাধারণ পুস্তকটি আনন্দ আশ্রমে 'কৈলাস'-এর অফিসে পাওয়া যাচ্ছে। মূল্য ২০০ টাকা।

'শিবানন্দ স্নেহনীড়ে' শারদীয়া মহাষ্টমী পূজা

আগামী ১৯শে অক্টোবর, ২০২৬, সোমবার (বাং ১লা কার্ত্তিক ১৪৩৩) সকালে 'কৈলাস'-এর আগরপাড়াস্থিত সেবাকেন্দ্র 'শিবানন্দ স্নেহনীড়ে' শারদীয়া মহাষ্টমী বিহিত পূজা নিবেদিত হবে আমাদের শ্রীগুরু স্বামী শিবানন্দ গিরি মহারাজের উদ্দেশ্যে। সকলের উপস্থিতিতে এই পূজা সার্থক হোক।

'পাঁচ সিকে পাঁচ আনা' পত্রিকার নবীকরণ

১১ই সেপ্টেম্বর ২০২৬ 'পাঁচ সিকে পাঁচ আনা' পত্রিকার ৫০-তম বর্ষ শুরু হচ্ছে। পত্রিকার সকল গ্রাহক-গ্রাহিকার কাছে অনুরোধ আপনারা বার্ষিক ৩০-টাকা জমা দিয়ে পত্রিকা গ্রাহকের নাম নবীকরণ করুন।

পাঁচ সিকে পাঁচ আনা
কৈলাসের মাসিক সংঘ সংবাদ পত্রিকা

।। নিয়মাবলী।।

- প্রতি বাংলা মাসের পূর্ণিমায় প্রকাশিত হয়।
  মাসিক চাঁদা তিন টাকা। বার্ষিক চাঁদা ত্রিশ টাকা।
- অতিরিক্ত ডাক খরচ লাগে না।
- পত্রিকা সময়মত না পেলে লিখে জানাতে হবে।
- সংঘের সংবাদ পরিবেশন, কীর্তন এবং সভায় আলোচিত গবেষণামূলক মূল্যবান তথ্যগুলি সংগ্রহ, নিদিধ্যাসন পত্রিকার উদ্দেশ্য।
- অতি মানব ও মহাপুরুষদেরজীবন ও মর্মবাণী সংগ্রহ এবং গবেষণা পত্রিকার প্রধান কাজ।
- প্রসঙ্গগুলি আশ্রমে বা আশ্রম আয়োজিত সভায় আলোচিত হবার পরই একমাত্র পত্রিকায় প্রকাশ লাভ করে।
- বৎসরের যে কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়।
  সম্পাদিকা—শর্মিলা ব্যানার্জী, ২১/২ বিডন স্ট্রীট, কলকাতা-৬
  প্রকাশক—অর্পণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২১/২ বিডন স্ট্রীট, কলকাতা-৬। ফোনঃ ২৩৫২-৭৩২৯
  মুদ্রক—শান্তিনাথ প্রেস, ১৬ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলকাতা-৬

Statement about ownership and other particulars of

PANCH SIKE PANCH ANA (FORM - IV)

According to rule 8 of the Registrations of News Papers (central Rules 1956)

Place of Publication	Kailash, 21/2, Beadon St. Kol-6
Periodicity of Publications	Monthly
Printer's Name	Sri Arpan Bandyopadhyay
Nationality	Indian
Address	Kailash, 21/2, Beadon Street, Kolkata-6
Publisher's name	Sri Arpan Bandyopadhyay
Nationality	Indian
Address	Kailash, 21/2, Beadon St. Kolkata-6
Editor's Name	Sarmila Banerjee
Nationality	Indian
Address	Kailash, 21/2 Beadon St. Kolkata-6
Name and Address of the Individuals who own newspaper	Kailash 21/2, Beadon St. Kolkata-6

Vol. XXXXX No-1 (ভাদ্র)
Publication Date : 7th September-2026

পাঁচ সিকে পাঁচ আনা
(Panch Sike Panch Anna)
Postal Regn. No. : KOL RMS / 38 / 2025-2027
Central Regn. No. : R. N. 32810 / 1977
Licensed to Post without Prepayment

বহুক্ষেত্রে শুধু নারায়ণশিলা বা শিবলিঙ্গে পূজা হয়। কিন্তু বিগ্রহ আনলে নতুন করে নারায়ণশিলা আনতেই হবে। ঐ নারায়ণশিলা প্রমাণ করে আমরা পৌত্তলিক নই। আমরা পুতুল পূজা করি না। ভক্ত নারায়ণশিলাকে বুকে করে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে ফেলে। বলে, আহা, কি সুন্দর তোমার হাসি। ঐ দেখা, পুতুল পূজার দেখা নয়। রূপের মধ্যে অরূপকে দেখে। দেখার মধ্য দিয়ে অদেখা লুকিয়ে পড়ে। প্রতিমাটা যে প্রতীক একথা মনে করিয়ে দেয়।

—স্বামী শিবানন্দ গিরি

Published and Printed by–Sri Arpan Bandyopadhyay, on behalf of Kailash, 21/2, Beadon Street, Kolkata-700 006 and Printed at–Santinath Press, 16 Hemendra Sen Street, Kolkata- 700 006 • Edited by–Sm. Sarmila Banerjee, 21/2 Beadon Street, Kolkata-700 006 • Owned by Kailash, 21/2, Beadon Street. Kolkata-700 006.